



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1140 - 1147

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

শিক্ষার স্বরূপ ও জীবনের পথচলা : একটি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

শ্বেতা চ্যাটার্জী

স্টেট এডেড কলেজ টিচার (SACT)

পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, উমেশচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

Email ID: swetac70@gmail.com

 0009-0001-1085-4013

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Education,
Skill,
Multipolar,
Perfection,
Creative,
Adaptation,
Social,
Emotional,
Tolerance,
Harmonious.

Abstract

Education is the overall development and manifestation of all innate qualities of a human being. It is a lifelong, continuous process which shapes the outer personality of an individual vis a vis the inner soul so that one can properly adapt and adopt in the societal situations which sometimes become challenging. Education may be considered as a biological procedure which is never ending. Aim of Education is the development of physical, psychological, moral, emotional and social well-being collectively together. Therefore, modern Education system aims not only at the curriculum but extra-curricular activities also. It focuses on family, society and community as a whole.

Lexically the term 'Education' means the process or technique of acquiring knowledge. It is the process of nourishing the mind of an individual through the act of teaching or instructions that make them lead their lives towards ultimate goal. It helps to bloom the tender and hidden qualities of life. It makes them co-relate between mind and soul, past and present, beauty and truth. All the great educators and philosophers of the world have laid importance on the fact that an individual's aim of education is to be a perfect human being with the Harmonious development of all human qualities. All of them have focused on the upliftment of moral values which is the foundation stone of a well-balanced character of an individual who can lead a nation towards progress. Proper education system should include discipline, free thinking and perseverance to achieve goal. A properly educated person must have fellow feelings; he should have awareness regarding environmental issues that affect our day to day's life resulting indelible mark in human civilization. A truly educated man is a leader who can lead the civilization honesty, peace, tolerance, universal brotherhood and above all, he should try to make this universe a place where all men can exist equally and peacefully irrespective of caste, creed and religion.

Discussion

ভূমিকা : জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই আসলে এক একটি পাঠ। অভিজ্ঞতার কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে জীবন যখন আমাদের ঋদ্ধ করে, ঠিক তখনই সে তার অর্জিত ঐশ্বর্য আমাদের হাতে তুলে দেয়। জীবনের এই অনুপম সৌন্দর্য ও সার্থকতা অনুভবের জন্যই ‘শিক্ষা’ অপরিহার্য। তবে মনে প্রায়শই প্রশ্ন জাগে— শিক্ষা আসলে কী? কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের চার দেয়ালে বন্দি থাকাই কি প্রকৃত জ্ঞান? আর এর উত্তর খোঁজার জন্য আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে ইতিহাসের দর্পণে এবং একইসাথে উন্মুখ থাকতে হবে আগামীর নতুন চিন্তাধারা গ্রহণে। সময় দ্রুত পরিবর্তনশীল, আর সময়ের এই পরিবর্তনের সাথে নিজেকে অভিযোজিত করতে না পারলে স্থবিরতা অনিবার্য। আর আমাদের এই স্থবিরতা পুরো দেশ ও জাতিকে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে, যার দায়ভার নিতে হবে নবাগত প্রজন্মকে। আসলে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন ঘটানো এবং তাকে সমাজের একজন দক্ষ ও সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বিত রূপই হল শিক্ষা। আর এই শিক্ষা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন একজন মানুষ তথা শিক্ষার্থী তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য নিরন্তর সাধনা চালিয়ে যায়। শিক্ষা আসলে কোনো সাময়িক বিষয় নয়। বরং এটি হল একটি বিমূর্ত, গতিশীল, জীবনব্যাপী, সমাজ নিয়ন্ত্রিত অভিযোজন প্রক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, -

“শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে।”^১

মানবজীবনকে বিশ্লেষণ করলে মূলত জৈবিক দিক (Biological aspect) এবং সমাজ সত্তার দিক (Sociological aspect) এই দুটি দিক ও দেখতে পাওয়া যায়। আর এই দুটি দিকের চাহিদা পূরণের জন্যই যা একান্তভাবে প্রয়োজন তা হল শিক্ষা যার ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী। বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ দার্শনিক, শিক্ষাবিদ তথা মনোবিদ তাঁদের জীবনাদর্শ ও সামাজিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষার নানাবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাই এই সংজ্ঞাগুলিকে এক মালায় গাঁথার চেষ্টা করা কষ্টসাধ্য শুধু নয়, কঠিনও বটে। তবে আদিম ও প্রাচীন ভারতীয় যুগে শিক্ষা শব্দটি যে অর্থ এবং তাৎপর্য বহন করেছিল, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ও আত্মতৃপ্তিই ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য তা কালের বিবর্তনের ফলে, বিজ্ঞান মনস্কতা, তথ্য ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নে এবং সর্বোপরি সমাজ জীবন ও জীবনাদর্শের পরিবর্তনে সেই শব্দের ধারণা আজ বহুলাংশেই পালটে গেছে। বলা ভালো আসলে আধুনিক সময়ে শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্য নতুন তত্ত্বে শিক্ষার ধারণা আজ অনেক বেশী সমৃদ্ধ হচ্ছে। তবে এরপরেও বলতেই হয় যে, মানবজীবনে আত্মবিকাশ এবং পরিপূর্ণতা আনার জন্যে শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার। শিক্ষাই মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী করে তোলে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ গোয়েটিং বলেছিলেন, -

“Just as there are certain vital process of life in a biological sense, so education may be considered as a vital process in a social sense.”^২

অর্থাৎ মানুষের নানাবিধ জৈবিক প্রক্রিয়া গুলোর মতোই শিক্ষাও মানুষের জীবনের এক জীবনদায়ী প্রক্রিয়া। আসলে ব্যক্তি জীবনের সামগ্রিক বিকাশের জন্য অর্থাৎ দৈহিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক-নৈতিক-প্রাক্ষেপিক-সামাজিক প্রভৃতি দিকের বিকাশের জন্য শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। সেই জন্যেই শিক্ষা আজ মানুষের সমাজ ব্যবস্থার সাথেও আট্টেপৃষ্ঠে জড়িত। শিক্ষার ইতিহাস যেন মানবসভ্যতার বিকাশেরই ইতিহাস। শিক্ষা আসলে আজ এক বহুমুখী প্রক্রিয়া (Multipolar process)। তাই আধুনিককালে শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যক্রম, ছাড়াও পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতিও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য বর্তমানে পত্র-যোগাযোগ শিক্ষা, দূরশিক্ষা ইত্যাদিরও ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এছাড়া এখন স্বয়ং শিক্ষার উপকরণ হিসেবে টেপেরেকর্ডার, ভিডিও, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই সবদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে, শিক্ষা আজ দ্বিমুখী বা ত্রিমুখী প্রক্রিয়া নয়, আসলেই এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। আর শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যেকটি উপাদানেরই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে এবং এর মধ্যে থেকে কোনো একটি উপাদান যদি তার যথার্থ ভূমিকা পালনে অক্ষম

হয়, তাহলে সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং একথা বলাই শ্রেয় যে, শিক্ষা হল একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। কিন্তু যখনই শিক্ষার প্রবাহ কোনো সংকীর্ণ কাঠামোর বেড়ালালে আটকে পড়ে, তখন তা কেবলমাত্র বিকাশের পথকেই অবরুদ্ধ করে না, বরং শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সৃজনশীলতাকেও অন্ধুরেই বিনষ্ট করে দেয়। মূলত শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে মানুষের ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যেই। বিবেক ও বিচারবুদ্ধিহীন এক মানবশিশু শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং উন্নত অভ্যাসের অধিকারী হয়ে ওঠে। তাই এই শিশু প্রক্রিয়া সামান্য সময়ের জন্য থমকে গেলেও শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যখন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো রাস্তায় প্লাস্টিক - আবর্জনা ফেলেন কিংবা অবহেলায় একটি চারাগাছকে উপড়ে ফেলেন, তখন বোঝা যায় তার শিক্ষা পুঁথিগত হলেও আত্মিক শিক্ষা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা মানুষের অন্তরের বোধকে জাগ্রত করে তাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মহিমান্বিত করে তোলে। শিক্ষা সম্পর্কে কবিগুরুর দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে ষোল আনা সত্য -

“সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। ... যদিবা ভাবগুলো একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলোকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিনত করতে পারি না।”^৩

শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধারণা : বাংলা, ইংরেজি ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা শব্দটির ব্যুৎপত্তি বা উৎস বিশ্লেষণ করলে এর গূঢ় অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে, ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন ও এর গভীরতা পর্যালোচনা করলে আমরা শিক্ষা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক ধারণা লাভ করতে পারি।

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত শিক্ষা শব্দটির ব্যুৎপত্তি মূলত সংস্কৃত ‘শাস’ ধাতু থেকে যার বহুবিশ অর্থ হল -- শিক্ষা দেওয়া, নির্দেশনা দেওয়া, শৃঙ্খলিত করা, শাসন করা বা নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ এই মতানুযায়ী শিক্ষণের কৌশলকেই শিক্ষা হিসেবে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। আবার অনেক সময়ে বাঙলা ভাষায় শিক্ষা শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে বিদ্যা গ্রহণ বা বিদ্যা অর্জন শব্দটিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ‘বিদ্যা’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিস্থল হল আবার সংস্কৃত ‘বিদ ধাতু যার অর্থ হল জানা বা জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ, এই শব্দটি ব্যবহার করলেও process/ technique of acquiring knowledge বা বাংলায় জ্ঞান অর্জনের কৌশলকেই বোঝায়।

আবার ইংরেজী Education শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাষাবিদগণ নানাবিধ ল্যাটিন শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। আর সেইসব শব্দের বিশ্লেষণ করলেই তাদের মধ্যকার তাৎপর্যগত পার্থক্যটি বোঝা যায়। সেগুলি হল যথাক্রমে -

প্রথমত : ইংরেজি Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Educare’ থেকে এসেছে। এখানে ল্যাটিন ‘Educare’ শব্দটির অর্থ হল— (i) To bring up অর্থাৎ লালন পালন করা বা প্রতিপালন করা, (ii) To nourish অর্থাৎ পরিচর্যা করা। এই মতানুযায়ী Education শব্দটির অর্থ হল পরিচর্যা করার মাধ্যমে বা প্রতিপালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত চেতনার বিকাশ সাধন করা এবং তাকে জীবনের উপযোগী করে তোলা।

দ্বিতীয়ত : Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Educere’ থেকে উদ্ভূত, যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে (i) To lead out বা To lead forth অর্থাৎ নির্দেশনা প্রদান করা। আবার এর অন্য একটি মানেও আছে, সেটি হল (ii) To draw out বা to drag out। যার মানে হল নিষ্কাশন করা। অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী Education শব্দটির অর্থ হল যথোপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে শিশু বা শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে যে সব মানসিক শক্তি ও প্রতিভা জন্মসূত্রে বিদ্যমান সেগুলির জাগরণ ঘটিয়ে সেগুলিকে বাইরে আনার বা নিষ্কাশন করার চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত : অন্য একটি মত অনুযায়ী Education ‘ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educatum থেকে এসেছে যার অর্থ হল, the act of teaching or instruction বা শিক্ষাদানের কাজ। সুতরাং, এই মতানুযায়ী শিক্ষার অর্থ হচ্ছে শিশু বা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তুলে ধরা।

আর সবশেষে চতুর্থ মত অনুযায়ী Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Edex এবং Ducrduc শব্দগুলো থেকে। যার শাব্দিক অর্থ হল যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা, তথ্যসংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা।

অর্থাৎ, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই বলা যায় যে— শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার জন্য পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন যাপনে সহায়তা করে।

তবে শিক্ষা কী? এই নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ দেশ-কাল ভেদে বহুবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন। আবার সেই শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়েই বিদগ্ধজনদের মধ্যে মতভেদও পরিলক্ষিত হয়েছে। আর থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ শিক্ষা কোনো স্থবির বিষয় নয়; বরং এটি ব্যক্তির প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়। জীবনমুখী প্রয়োজনের নিরিখে দেখলে, একজন ঐতিহাসিকের কাছে যেমন চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক, তেমনি স্থাপত্যশৈলীর নিপুণ কারুকার্যে কৃষিবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, যুগের পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে যেমন একদিকে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণাও গতি পেয়েছে। তাই আদিম ভারতীয় যুগের শিক্ষায় যে অনিয়ন্ত্রিত রূপটির ছবি উপস্থাপিত হয়েছে, যার লক্ষ্যছিল অন্ন-বস্ত্রের মতো মৌলিক চাহিদার নিবৃত্তি সাধন, সেটিই কালের গতিচক্রে প্রাচীনযুগে কিছু নতুনত্বের ছাপ নিয়ে ব্যক্তিকে সত্য অনুসন্ধান বা আত্মজ্ঞান উপলব্ধিতে প্রবৃত্ত করেছে। তা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও প্রাণতন্ত্রমণীয় ব্যক্তিদের সুচিন্তিত মতামত থেকেই বোঝা যায়। যেমন - প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদে আছে: শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মত্যাগী করে তোলে। আবার উপনিষদে বলা হয়েছে যে, “সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে” — অর্থাৎ, যা মানুষকে যাবতীয় সংকীর্ণতা ও বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়, তাই-ই শিক্ষা। অন্যদিকে শিক্ষাবিদ কৌটিল্য বলেছেন যে, শিক্ষা হল শিশুকে দেশ বা জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কৌশল। দার্শনিক ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য্যের কথায়, আত্মজ্ঞান লাভই হল শিক্ষা। আবার প্রাচীন যুগের এই ধর্মান্বিতা ও অধ্যাত্মবোধের শিক্ষার ধারণার বর্তমান যুগে ব্যাপকতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মনীষীগণ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন ও প্রজ্ঞার আলোকে শিক্ষার সংজ্ঞাকে বিদ্ধ করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে। এই সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে দেশীয় ও বৈশ্বিক চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, এতে সর্বজনীনতার অভাব রয়েছে। তবে এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব— আর তা হল - সত্যের অন্বেষণ, সুন্দরের আরাধনা এবং মানবসত্তার সার্থক অভিযোজনার্থে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জীবনের প্রস্তুতিকল্পে পূর্ব অভিজ্ঞতাভিত্তিক, ব্যক্তি ও সমাজ কল্যাণমুখী চরম উৎকর্ষ সাধনই হল শিক্ষা।

প্রাচ্যের দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে শিক্ষা :

- স্বামী বিবেকানন্দ - এর কথায়, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই হল শিক্ষা অর্থাৎ (Education is the manifestation of perfection already in man)।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন - তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।
- জাতির জনক গান্ধীজি বলেছেন, - An all-round development drawing out of the best in child and man - body, mind and spirit. অর্থাৎ, অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহ, মন ও আধ্যাত্মিক দিকের সর্বোত্তম বিকাশ, শিক্ষার দ্বারাই হয়।
- স্বামী দয়ানন্দের মতে, - শিক্ষা হল চরিত্র গঠন এবং ধার্মিক জীবনযাপনের উপায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টিতে শিক্ষা :

- প্রকৃতিবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক রুশোর (Rousseau) মতে, Education is the child's development from within. অর্থাৎ, শিক্ষা হল শিশুর অন্তর্নিহিত বিকাশ।

- প্রয়োগবাদী শিক্ষাবিদ জন ডিউই (John Dewey) বলেছেন, Education is the reconstruction of experiences through self activities. অর্থাৎ, শিক্ষা হল আত্মক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পুনঃসৃজন।
- হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) কথায়, Education is the preparation of complete living for future. অর্থাৎ, শিক্ষা হল ভবিষ্যতের জন্য পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি।
- পেস্তালৎসি (Pestalozzi) বলেছেন, Education is the harmonious and progressive development of all the innate powers and faculties of man physical, intellectual and moral. অর্থাৎ, শিক্ষা হল মানুষের দক্ষতা ও সর্বপ্রকার জন্মগত ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমবর্ধনশীল উন্নয়ন-দৈহিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক।

অর্থাৎ, উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে বলা যায় - শিক্ষা কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞান বা তথ্য আহরণ নয়, বরং এটি মানুষের দেহ, মন ও আত্মার এক সুসমন্বিত ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়া। মানবিক প্রবৃত্তিগুলোকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যক্তিকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। এবং এই অর্জিত প্রজ্ঞা দিয়েই মানুষ ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে। অজানাকে জানার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে শিক্ষা মানুষকে তার সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছাড়িয়ে এক অসীম ও অনন্তের পথপ্রদর্শন করে। তবে সমাজের প্রচলিত প্রেক্ষাপটে শিক্ষার দুটি ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়— ব্যাপক অর্থ এবং সংকীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে কোনো একটি সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সীমিত প্রশিক্ষণকে বোঝায় না। এটি হল জীবনব্যাপী, নিরন্তর প্রক্রিয়া, যা শিশুর জন্মগত সামর্থ্য, অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা এবং স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাচেতনার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, ব্যক্তির জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ও উন্নয়ন ঘটমান তাই হল শিক্ষা। এই অর্থে শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর সকল রকম সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশ। এবং তাই এর লক্ষ্য হল- শিক্ষাকে শিক্ষালয় জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুকে সক্রিয় করে তোলার মাধ্যমে বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। সুতরাং বলা যায় যে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মূলত শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে তার আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ও নৈতিক মূল্যবোধের উত্তরণের দিকেই প্রধানত মনোনিবেশ করে। অন্যদিকে, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় একটি সীমাবদ্ধ গভীর মধ্যে বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের আওতায় শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থেকে কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করাকে। এবং এই ধারায় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ, ভালো রেজাল্ট, ডিগ্রী ও সনদ অর্জন এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি নিশ্চিত কর্মসংস্থান খুঁজে নেওয়া। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, এটি হল আসলে পুথিনির্ভর এবং বিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি গতিহীন প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার্থীর উদার মানসিকতা গঠনের পরিবর্তে তাকে কেবল জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার মন্ত্র শেখায়।

তবে শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সেই পবিত্র ও মধুর সম্পর্কের মাঝে, যেখানে শিক্ষার প্রথাগত রূপ গ্রহণের প্রারম্ভিককালে বা প্রাচীন মনুষ্যসমাজে শিক্ষক যেমন ছিলেন তেমন একাই জ্ঞানের ধারক বা তথ্যদাতা না হয়ে, বরং একজন পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা ও অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাই আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার যুগে শিক্ষকের ভূমিকা জ্ঞানের আধার ও শাসনকর্তার গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানতৃষ্ণাকে প্রজ্বলিত করা, তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখানো এবং তার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর কারিগর হিসেবে স্বীকৃত। আসলে বর্তমান সময়ে শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র জ্ঞানের সঞ্চালন করাই নয় বরং একজন প্রকৃত শিক্ষক সেই যিনি শিক্ষার্থীর যাবতীয় ভুলগুলিকে সংশোধন করে, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে উৎসাহ প্রদান করেন এবং শিশুকে জাতীয় আদর্শের যোগ্য ধারক হিসেবে গড়ে তোলেন।

তাই বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার চরম লক্ষ্য কেবল জীবিকা অর্জন নয়, বরং শিশুকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। অ্যারিস্টটলের ভাষায়, শিক্ষা একটি মহৎ শিল্প যা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি থাকলেও আধুনিক সময়ে এর লক্ষ্য হয়েছে শিশুর সর্বস্বীয় বিকাশ ও সুযোগ্য সুনামগরিক হিসেবে সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠা করা। আসলে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মাঝে নৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করে, তাকে সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় এবং একটি বলিষ্ঠ চারিত্রিক ভিত্তি তৈরি করে। একই সাথে এটি

যেমন শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখায়, তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি ও মেধার ওপর ভিত্তি করে এবং দেশ ও কালের প্রয়োজনে শিক্ষার এই লক্ষ্যসমূহ প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হয়। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এখন মূল্যবোধের প্রসার, প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, জেতার সমতা এবং পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার চূড়ান্ত সার্থকতা হল ব্যক্তির আপন সত্তার উন্মোচন এবং আত্ম-উপলব্ধি, যার মাধ্যমে সে নিজেকে দেশ ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করে এক সার্থক ও স্বপ্নময় জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন নয়, বরং একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এক জীবনব্যাপী ও নিরন্তর প্রক্রিয়া যা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ তথা শিক্ষা বোর্ডগুলোর নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়। মূলত শিক্ষার মূল সুরটি বাধা রয়েছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন এবং জাতীয় চেতনার মেলবন্ধনের উপরেই। শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে শিক্ষার্থীর মননে নৈতিকতা, মানবিকতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ বপন করা হয়, যাতে তার কর্ম ও আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে। এটি কেবল ব্যক্তিজীবনের উন্নয়ন নয়, বরং একটি আদর্শ জাতি গঠনেরও প্রথম ধাপ। জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেমও শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই ভারতের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন ন্যায়বোধ, কর্তব্য পরায়ণতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হয়, তা নিশ্চিত করাও শিক্ষার অন্যতম প্রধান ব্রত। এর মাধ্যমেই তাদের চরিত্রে সুনামগরিকের গুণাবলি, যেমন— মুক্ত বুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা এবং সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা বিকশিত হয়। শিক্ষা মূলত এখানে প্রজন্মের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে, যা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে সঞ্চারিত করে। এছাড়া শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ ও সৃজনশীল করার লক্ষ্যে দেশজ আবহে জ্ঞান বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনধর্মী ও উৎসাহমুখী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে সরাসরি অবদান রাখবে। একই সঙ্গে, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যের পরিবর্তে একটি সেবামূলক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সহনশীলতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শে দীক্ষিত হতে পারে সেটিই আসলে শিক্ষার লক্ষ্য। এছাড়া আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মনন বিকাশে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করার দিকেও শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্ব দিয়েছে। যার ফলে আশা করা যায়, দেশ এক জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। পাশাপাশি, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপও ধারণ করেছে। পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার এই বহুমুখী উদ্দেশ্যসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে একজন শিক্ষার্থী কেবল জ্ঞানপিপাসু হিসেবে নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও আগামীর পথরেখা : বর্তমান বিশ্ব ও সমকালীন জীবনপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আমরা প্রতিনিয়ত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছি, তখন একটি রুঢ় সত্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। আর সেটি হল গিয়ে এই যে, আজ আমরা শিক্ষাকে যে মাপকাঠিতে বিচার করছি— যেমন জাঁকজমকপূর্ণ শিক্ষালয়, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তা আর সুবিন্যস্ত পাঠ্যক্রম— তা মূলত শিক্ষার বাহ্যিক আবরণ মাত্র, প্রকৃত নির্ঘাস নয়। আমরা আসলে ভুলবশতই শিক্ষালয় এবং শিক্ষার মূল সুরকে এক করে ফেলছি বারবার। অথচ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমাদের দেশে শিক্ষার যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তা কেবলমাত্র চার দেয়ালের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষ তখন শিক্ষা লাভ করত প্রকৃতি, পরিবার এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায় থেকে। যদিও পাশ্চাত্যে প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের মাধ্যমে এবং এদেশে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার হাত ধরেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বীজ রোপিত হয়েছিল। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে শিল্পায়ন আর পুঁজিবাদী মানসিকতার চাপে শিক্ষাকে আমরা কেবল একটি সনদ (সার্টিফিকেট) প্রাপ্তির হাতিয়ারে পরিণত করেছি।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা মানেই হল পরীক্ষার খাতায় ভালো নম্বর পাওয়া আর দিনশেষে একটি কাজ্জিত চাকরি লাভ করা। এই যে দক্ষতার চেয়ে নম্বরের মোহ এবং জীবনের চেয়ে জীবিকাকে বড় করে দেখার প্রবণতা, এটিই আসলে আমাদের জাতীয় মেধা ও সৃজনশীলতাকে অনবরত পঙ্গু করে দিচ্ছে। যেখানে সম্পদ ও ঐশ্বর্য আছে তবে আনন্দ নেই। যেখানে আছে কেবলমাত্র মুখস্থবিদ্যার শাসন। আর আছে প্রতিটি অনন্য প্রতিভাকে কেবল কয়েকটি গাণিতিক সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করার কায়দা। তাই এখানে প্রকৃত শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটে চলেছে। তাই আমরা আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন একে অপরের সাথে তুলনা করা বাতুলতা জেনেও তুলনা করে চলেছি, ঠিক তেমনি একজন ভালো খেলোয়াড় বা শিল্পীকে গণিতের পাল্লায় মেপে ‘অপদার্থ’ ঘোষণা করার মতো চরম হীনম্মন্যতার কাজও করে চলেছি। আসলে আমরা আজ এমন এক যান্ত্রিক গোলকধাঁড়ায় আটকা পড়েছি যেখানে শিক্ষা নৈতিকতা তৈরির বদলে অর্থ- উপার্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের চেয়েও বেশী আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকট হচ্ছে। আমরা সিলেবাসে নৈতিকতা পড়ছি, পরীক্ষায় খাতায় নৈতিকতার উত্তর লিখছি, কিন্তু বাস্তব জীবনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ অনুভব করছি না। তাই এই গভীর সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ একটাই। আর তা হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং শিক্ষককে তাঁর প্রাপ্য গুরুর মর্যাদা ও সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া। আসলে শিক্ষার এই সংকট উত্তরণে এবং একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমাদের প্রচলিত চিন্তার আজ আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তাই শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত আনন্দদায়ক ও সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা। এছাড়াও দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করাও আজ সময়ের দাবি। একজন মেধাবী প্রকৌশলী যদি প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের সাথে তাঁর স্বপ্ন ও উদ্ভাবন ভাগ করে নেন, তবেই একমাত্র সেই শৈশবকালটাই হয়ে উঠতে পারে বিশ্বমানের গবেষণাগার। শিশুর কল্পনাশক্তি ও প্রশ্ন করার স্বাধীনতাকে অবরুদ্ধ না করে বরং তাকে দিতে হবে ডানা মেলার সুযোগ। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধা ও রুচি ভিন্ন একথাকে স্বীকার করে, তাদের জোর করে একই ছাঁচে না ফেলে বরং যার যে বিষয়ে ঝোঁক, তাকে সেই দিকেই বিকশিত হতে দিতে হবে। অর্থাৎ, যে শিক্ষার্থী গানে পারদর্শী তাকে ক্যালকুলাসের জটিলতায় পিষ্ট না করে তাকে তাঁর শৈল্পিক সত্তাকে লালন করতে দেওয়াই হবে রাষ্ট্রের কর্তব্য। আসলে পাঠ্যবইয়ের সংজ্ঞা মুখস্থ করার চেয়েও জীবনঘনিষ্ঠ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ নিশ্চিত করা বেশী জরুরি। নৈতিক চরিত্র কেবলমাত্র বই পড়ে বা এর-ওর কথা শুনে নয়, বরং প্রতিদিনের অভ্যাসের মাধ্যমেই গড়ে তুলতে হবে। মূলত একজন শিক্ষার্থী কতটুকু পরোপকারী বা সং হলো, তার প্রতিফলন ঘটা উচিত তাঁর যাপিত জীবনে, পরীক্ষার খাতায় নয়। শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, সহনশীলতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বীজটিকে ঠিকঠাক ভাবে বপন করতে হবে। প্রতিটি ধর্মের মূল নির্যাস— যেমন হিন্দু ধর্মের প্রেম, ইসলামের শান্তি, বৌদ্ধ ধর্মের সহিষ্ণুতা— এগুলো যেন কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীর হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমাদেরকে নিজেদের সংস্কৃতির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে; জাপানের মতো নিজেদের সৃষ্টিকে শিল্পের মর্যাদায় নিয়ে যেতে হবে। আর যখন আমরা নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বকীয়তাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে পারব, তখনই জাতি হিসেবে আমাদের মেরুদণ্ডও শক্ত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষার চূড়ান্ত সার্থকতা কেবল বৈষয়িক উন্নতিতে নয়, বরং একটি সুন্দর, রুচিশীল ও মানবিক সমাজ গঠনে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিকে যেমন দমন করে তেমনি ব্যক্তির ভেতরের সুপ্ত মানবিক গুণাবলিকেও জাগিয়ে তোলে। এটি আসলে এমন এক প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে জাতীয় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী করে এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই প্রতিটি শিক্ষালয় হওয়া উচিত এক একটি গবেষণাগার, যেখানে শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যার দাসত্ব ভেঙে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পৃথিবীকে চিনবে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা এবং অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই হবে শিক্ষিত মানুষের প্রকৃত পরিচয়। আর যখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কেবল শ্রমিক না বানিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে, এবং শিক্ষকরা যখন সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা নিয়ে, স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে আবির্ভূত হবেন, তখনই আমরা একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারত গড়তে সক্ষম হব। শিক্ষা হোক অন্তর ও বাহিরকে আলোকিত করার এক নিরন্তর সাধনা, যা আমাদের জীবনকে করবে স্বাচ্ছন্দ্যময় আর আত্মাকে করবে পরিশুদ্ধ।



Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, আষাঢ়, ১৪২৭, পৃ. ২৩০
২. রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, ২০১২-২০১৩, পৃ. ৩
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী, আষাঢ়, ১৪২৭, পৃ. ১৩

Bibliography:

- সরকার, ড. অমল কান্তি, প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম, রীতা পাবলিকেশন, ২০১৬
- পাল, ড. দেবশিস, শিক্ষাবিজ্ঞান, রীতা পাবলিকেশন, ২০২৪
- রায়, ড. সুভাষচন্দ্র, শিক্ষাবিজ্ঞান, সাঁতরা পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮
- রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, ২০১৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা, শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি, বি. বি. কুন্ডু গ্র্যাণ্ড সঙ্গ, ২০২২
- Aggarwal, J.C., Theory and Principles of Education, VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD, 2010
- Ravi, S. Samuel, A Comprehensive Study of Education, PHI Learning Private Limited, 2022
- ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮